International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)

E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

# সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে উজান সাধনা

## ড. তপোব্রত ভাদুড়ি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়

**সারাংশ** –

সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম বাংলার একটি বিশিষ্ট লোকায়ত ও কায়সাধনাভিত্তিক ধর্মীয় সম্প্রদায়। সহজিয়া বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের অবস্থান মন্দিরে নয়, বরং নরবপু বা মানুষের দেহের মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। সাধারণ ভাবে মানুষের কামপ্রবৃত্তির গতি নিম্নাভিমুখী। সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে এবং ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে এই অধঃমুখী প্রাকৃত কামকে মেরুদণ্ডের সুষুম্না নাড়ী দিয়ে শিরোপরি সহস্রারে ঊর্ধ্বমুখী করার নামই ‘উজান সাধনা’। এই প্রক্রিয়ায় বিষাক্ত কাম পরিশোধিত হয়ে অপ্রাকৃত প্রেমে বা অমৃত রসে রূপান্তরিত হয়। সহজিয়া সাধনার তিনটি স্তর রয়েছে – প্রবর্ত, সাধক এবং সিদ্ধ। আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য এই সাধনায় উপযুক্ত সাধনসঙ্গিনী বা পরকীয়া নায়িকার প্রয়োজন। মানুষের দৃশ্যমান স্থূল শরীর হল ‘রূপ’ এবং তার অন্তরের দিব্য সত্তা হল ‘স্বরূপ’। স্থূল রূপের উপরে দিব্য স্বরূপের আরোপ ঘটিয়ে তাঁরা লৌকিক মলিনকে অলৌকিক ভগব□-প্রেমের স্তরে উন্নীত করেন।

**সূচক শব্দ** – গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম, রাগাত্মিকা ভক্তি, রাগসাধনা, উজান সাধনা, বাণসাধনা, পিরীতি-সাধন, রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব

## ভূমিকা

বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম এবং তার রহস্যময় ‘উজান সাধনা’ অত্যন্ত তা□পর্যপূর্ণ এক অধ্যায়। প্রাচীন বাংলায় পালযুগে রাজশক্তির ছত্রছায়ায় সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের যে স্বর্ণযুগ গড়ে উঠেছিল, সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ফলে তা তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। আত্মরক্ষার তাগিদে সমাজের নিম্নবর্গের এই বৌদ্ধ সহজযানীরা সেন রাজাদের প্রিয় কৃষ্ণোপাসনা বা বৈষ্ণব ধর্মের মধুর রসের আড়ালে নিজেদের গোপন কায়সাধনা বজায় রাখেন। কালক্রমে বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায় বৈষ্ণবদের রাধা ও কৃষ্ণে রূপান্তরিত হয়ে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের জন্ম দেয়। ষোড়শ শতকের শেষে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র এই ব্রাত্য সম্প্রদায়কে সামাজিক স্বীকৃতি দিলে তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন। তবে প্রচলিত তত্ত্বের বাইরে গিয়ে তাঁরা মানুষের রক্তমাংসের দেহকেই ভজনের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ধারা গড়ে তোলেন।

## পর্যালোচনা

বৌদ্ধগ্রন্থ ‘দিব্যাবদান’ ও ‘মহাবংস’-এ উল্লিখিত তথ্যসূত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম গুপ্তযুগের আগেই বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।[১] গুপ্তসম্রাটরা প্রধানত ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও বৌদ্ধরা তাঁদের উদার দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হননি। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে ফা-হিয়েন যখন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে আসেন, তখন শুধুমাত্র তাম্রলিপ্ত অঞ্চলেই বাইশটি বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব

ছিল।[২] গুপ্তবংশের পতনের পর গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্ম তীব্র রাজরোষের সম্মুখীন হয়। শশাঙ্ক ছিলেন ঘোর শৈব। হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁকে বৌদ্ধবিদ্বেষী ও বৌদ্ধঘাতী বলে নিন্দা করা হয়েছে।[৩] বস্তুত পক্ষে, শশাঙ্ক- পরবর্তী পালযুগই বাংলার ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ। পরমতসহিষ্ণু পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি শুধু শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন না, ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন ‘পরম সৌগত’। তাঁদের অর্থানুকূল্যে একদিকে যেমন বাংলার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়, অন্যদিকে তেমনি রাজশক্তির সমর্থনপুষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী জনসাধারণও নির্ভয়ে ধর্মাচরণ করতে শুরু করেন। বাংলায় এই যুগেই সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপাল থেকে যে চর্যাগানগুলি আবিষ্কার করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের সেই প্রাচীনতম নিদর্শনগুলি এই যুগেরই রচনা।

পালবংশের পতনের পর কর্ণাটদেশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনরাজারা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এসময়ে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। সহজযানী বৌদ্ধদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ। পালযুগে রাজশক্তির ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করে এঁরা উচ্চবর্ণের শোষণ ও নিপীড়নের হাত থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেন আমলে বর্ণহিন্দুরা ক্ষমতাসীন হয়ে এঁদের ওপর আবার উ□পীড়ন আরম্ভ করেন। বাধ্য হয়ে এঁদের মধ্যে অনেকেই দেশত্যাগী হন, কেউ কেউ আবার নিজেদের ধর্মকর্ম যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দুধর্মের মধ্যেই আত্মগোপন করেন।

সেন রাজত্বে স্মৃতিশাস্ত্র অনুমোদিত পঞ্চোপাসনার রীতিই সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তবে এর মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের ধারাটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তার একটা বড়ো কারণ, সেন রাজারা ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দনের উপাসক। দক্ষিণ ভারতে সুদূর অতীতকাল থেকে আড়বার সাধকদের মাধ্যমে বিষ্ণুভক্তিবাদের যে ঐতিহ্যটি গড়ে উঠেছিল, সেন রাজারা বাংলাদেশে তার সূত্রপাত করেছিলেন। সেন আমলে এই ভক্তিধর্মের চর্চা শুধু দেবালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; রাজসভায় রচিত কাব্য-কবিতার মধ্য দিয়েও তা শতধারায় বিকশিত হয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের লেখা ‘গীতগোবিন্দম্’ কাব্যটি নিঃসন্দেহে এই ধারার শ্রেষ্ঠ রচনা। গোবর্ধন আচার্যের লেখা ‘আর্যাসপ্তশতী’ এবং ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ ও ‘সুভাষিত রত্নকোশ’-এর মতো সমকালীন অন্যান্য কাব্য সংকলনের মধ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহু ক্ষুদ্র কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ সেন নিজেও রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যের দিকে নজর রাখলে মোটামুটিভাবে মনে হয়, সেনযুগের বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের যে ধারাটি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সেটি হল রাগভক্তিমূলক কৃষ্ণোপাসনার ধারা। বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় সহজিয়া বৌদ্ধদের পক্ষে এই মধুরসাশ্রিত ভক্তিধর্মের আড়ালে নিজেদের মিথুনাত্মক গুহ্যসাধনার ঐতিহ্যটিকে প্রচ্ছন্ন রাখতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। এরই ফলস্বরূপ বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায় বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণে রূপান্তরিত হয় এবং সহজিয়া বৌদ্ধদের সহজিয়া বৈষ্ণবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

বলা বাহুল্য, অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সহজিয়া বৌদ্ধরা নিজেদের বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেও প্রধানত তাঁদের বিসদৃশ ধর্মাচরণের জন্যই সাধারণ বৈষ্ণবরা এঁদের খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। সুতরাং, সমাজের বুকে এঁরা আগের মতো ব্রাত্য হয়েই ছিলেন। শোনা যায়, ষোড়শ শতকের শেষদিকে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র এইরকম কয়েক হাজার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করে পরোক্ষভাবে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[৪] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলীতে আশ্রয় লাভ করে চৈতন্যদেবের প্রচারিত রাগভক্তির আদর্শকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেও সহজিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল। সাধারণভাবে চৈতন্য-অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করতেন, জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা

শক্তি; অতএব জীবের পক্ষে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে শ্রীরাধিকা বা অন্য ব্রজগোপীদের মতো রাগাত্মিকা ভক্তির সাধন করা সম্ভব নয়, রাগানুগা-মার্গে মঞ্জরীভাবের উপাসনাই জীবের পক্ষে 'সর্বসাধ্যসার'। কিন্তু বৈষ্ণব সহজিয়ারা এই মত গ্রহণ করতে রাজি হননি। তাঁরা মনে করতেন, মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় যেমন তাঁর মধ্যে রাধাভাবের সম্যক স্ফূর্তি ঘটেছিল, তেমনি প্রতিটি জীবের পক্ষেই রাগসাধনার দ্বারা চিন্ময়ী রাধাতনু লাভ করে শ্রীভগবানের সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে লীলাবিলাস ও আনন্দসম্ভোগ করা সম্ভব।[৫]

এই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সহজিয়া বৈষ্ণবরা সহজযানী বৌদ্ধদের মতোই দেহসাধনার পন্থা অবলম্বন করেছেন। বৌদ্ধ সহজিয়ারা যেমন বিশ্বাস করতেন 'স্বদেহে তত্ত্বং ব্যবস্থিতম্', বৈষ্ণব সহজিয়ারাও তেমনি ঘোষণা করেছেন 'ভজনের মূল এই নরবপু দেহে'। সহজিয়াদের কল্পনায় আদ্যাশক্তিরূপিণী যোগমায়াই সৃষ্টির ক্রম ধরে নেমে এসে জীবশক্তিতে পরিণত হয়ে মানবশরীরের মূলাধারে কুণ্ডলিনীরূপে অর্চিত পড়ে আছেন। আর সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন মানুষের শিরোদেশে 'উল্টা কমল'-এর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গুপ্তচন্দ্রপুরে। সহজিয়ারা বলেন, পরমাত্মার আনন্দরস সহস্রার পদ্মের অক্ষয় সরোবর থেকে অবিরত ধারায় ক্ষরিত হচ্ছে। কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত থাকার ফলে জীবরতি বা প্রাকৃত কামের উদয় হয়ে নিত্যই তা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে নিম্নাভিমুখী অমৃতের ধারাকে পুনরায় ঊর্ধ্বগতি করাতে পারলে প্রাকৃত কামই অপ্রাকৃত প্রেমে রূপান্তরিত হয়। তখন বিশুদ্ধসত্ত্ব সাধক হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত হয়ে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলায় মিলিত হন।[৬] এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের বিশিষ্ট সহজিয়া সাধক আকিঞ্চন দাস 'বিবর্তবিলাস' গ্রন্থে লিখিছেন– 'অতএব রতিরস যেই ভক্ত সাধে।/ তার হবে প্রাপ্তি নিত্য বৃন্দাবন মাঝে।/ রতিরস প্রাকৃতকে অপ্রাকৃত করি।/ তবে পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ হরি।/ বিষিকে অমৃত ভাই যে পারে করিতে।/ কামরতি বিষিজারি হইবে প্রেমেতে।।'[৭]

বৈষ্ণব সহজিয়ারা তাঁদের এই রতিরসের সাধনা বা বিষামৃতের সাধনাকে 'উজান সাধনা' বা 'বাণসাধনা' নামেও অভিহিত করেছেন। প্রতিোষ দাস তাঁর 'সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে 'বাণসাধনা'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখিছেন, 'অর্জুন যেমন নিম্নে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার একনিষ্ঠার ফলে শতযোজন ঊর্ধ্বে মৎস্যচক্র ভেদ করিয়াছিলেন, বাণ-সাধনার লক্ষ্যও হইল ঐরূপ। প্রাকৃত কামরতির গতিই হইল অধঃদিকে, সেই অধঃমুখী রতিকে নিষ্ঠার দ্বারা ধারণ ও শোধন করিয়া সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া ঊর্ধ্বে সহস্রারের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলে উহা উজ্জ্বল রসে পরিণত হয়। এইরূপে প্রাকৃত রতিকে অপ্রাকৃত চিন্ময় আনন্দময় রসে পরিণত করাই বাণ-সাধনার উদ্দেশ্য...।'[৮]

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, বৈষ্ণব সহজিয়ারা মানুষের সহজাত কামপ্রবৃত্তিকে জোর করে উচ্ছেদ করার কথা বলেননি। তাঁরা মনে করতেন, কাম ও প্রেমের মধ্যে স্বরূপত কোনো প্রভেদ নেই। ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের জন্য বিন্দুর ক্ষয় হলে তা কাম নামে অভিহিত হয় আর ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা বিন্দুর অধোগতি রোধ করে তাকে পরিশোধিত ও ঊর্ধ্বায়িত করলে সেই একই বিন্দু নির্মল প্রেমে পরিণত হয়।[৯] আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সহজিয়াদের এই দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ বিচার করতে গিয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'গুহ্যসাধক সম্প্রদায় মাত্রেরই মতে, মানুষের যৌনবৃত্তির সম্পূর্ণ অবদমন সম্ভব নয় ...। সুতরাং দৈহিক ও মানসিক সংযমের দ্বারা তার স্থূলতা দূরীভূত করাই শ্রেয়ে।'[১০]

সহজ সাধনার মোট তিনটি অবস্থা ও পাঁচটি আশ্রয়। প্রথমে প্রবর্ত অবস্থায় নাম ও মন্ত্র – এই দুটি আশ্রয়। দ্বিতীয় অবস্থার নাম সাধক অবস্থা, এই অবস্থার আশ্রয় ভাব। তৃতীয় অবস্থা সিদ্ধ অবস্থা, তারও আশ্রয় দুটি– প্রেম ও রস। প্রবর্ত অবস্থায় কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে রেতে বা বিন্দুকে ধারণ করতে হয়। তখন নারীসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সাধক অবস্থার সাধনাকে বলে বাহ্য সাধনা বা গৌণ পরকীয়া সাধনা। এই

দশায় রসিক সাধক বিন্দুকে ঊর্ধ্বমুখে সঞ্চালিত করে সহস্রারে নিয়ে যান। বলা বাহুল্য, অটল বীর্যকে ক্ষুব্ধ করতে হলে প্রকৃতির সাহচর্য একান্ত আবশ্যক। সুতরাং সাধনার প্রয়োজনেই এই পর্যায়ে সহজিয়া সাধককে উপযুক্ত সাধনসঙ্গিনী গ্রহণ করতে হয়। সহজিয়াদের 'পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন'। প্রবৃত্তি-তাড়িত 'সামান্য মানুষ' বা 'রাগের মানুষ'-এর দ্বারা তা সম্ভব নয়। কলুষিত কামসংস্কার-মুক্ত না হয়ে এই বিপজ্জনক সাধনায় ব্রতী হলে পদস্খলন অনিবার্য। সহজিয়া কবি চণ্ডীদাস একটি সাধন-প্রহেলিকায় এই দুর্গম পথের দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের বিশেষভাবে সতর্ক করার জন্য লিখেছেন, 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি তবে তো রসিকরাজ।'[১১] আসলে, সাধক অবস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য হল প্রাকৃত কাম বা খণ্ড রতিকে দিব্যপ্রেমে বা অখণ্ড রতিতে রূপান্তরিত করা। ভাবাশ্রয়ী এই রাগসাধনায় স্থূল দেহসুখকামনার কোনো স্থান নেই।[১২]

বাহ্য সাধনার পরবর্তী পর্যায় সিদ্ধ অবস্থা। সিদ্ধ অবস্থার সাধনাকে মর্ম সাধনা, মুখ্য পরকীয়া সাধনা বা রাধাপ্রেমের সাধনাও বলা হয়। ভাবসাধনার পরিপক্কতার ফলে সাধকের সর্ব ইন্দ্রিয় যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখনই মুখ্য পরকীয়া সাধনার সূচনা হয়। এই দশায় বিশুদ্ধসত্ত্ব সহজিয়া সাধক রাধাভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীভগবানের প্রেমমাধুর্য আস্বাদন করেন এবং অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু লাভ করে পরমপুরুষের সঙ্গে মিলিত হন।[১৩]

দেখাই যাচ্ছে, গৌণই হোক আর মুখ্যই হোক, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মে সাধারণভাবে পরকীয়া সাধনের গুরুত্ব অপরিসীম। চণ্ডীদাসের পদে বলা হয়েছে, 'পরকীয়া রতি করহ আরতি সেই সে ভজন সার।।' পরিতোষ দাস তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সহজিয়া ধর্মমতে পরকীয়া দুই প্রকার: মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য পরকীয়া হইল রাধাপ্রেমের সাধনা, যাহাকে মর্ম-সাধনা বলা হয়। ... মুখ্য পরকীয়া সাধনার প্রস্তুতি হিসেবে গৌণ পরকীয়া সাধনা অবলম্বিত হয়। গৌণ পরকীয়াতে রতি-রসের বা কামের সাধনা হয়। প্রাকৃত কামকে প্রথমে অকাম এবং পরে অপ্রাকৃত মহাকামে পরিণত করিবার উপায় রূপে গৌণ পরকীয়া সাধনার রীতি সহজিয়া ধর্মশাস্ত্রে বিহিত।'[১৪]

বৈষ্ণব সহজিয়াদের এই গৌণ পরকীয়া সাধনার মূল ভিত্তি আরোপতত্ত্ব তথা রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব। তাঁদের কল্পনায়, প্রত্যেকে মানুষের দুটি সত্তা আছে– একটি পিতামাতার শুক্রশোণিতের সম্মিলনে গঠিত স্থূল মায়িক সত্তা বা 'রূপ', আর অন্যটি তার অন্তর্নিহিত দিব্য সত্তা বা 'স্বরূপ' । তাঁরা আরও 'বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকে নরনারীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ সর্ববীজ ও সর্বস্ত্রীরূপধারিণী হয়ে নিত্যলীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন।'[১৫] সংসারে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়, 'স্বরূপ' বিস্মৃত হয়ে নরনারীর অন্ধ কামপ্রবৃত্তি 'রূপ'-এর আকর্ষণে চলেছে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের পথে। সহজিয়ারা 'রূপ'-এর মধ্যে 'স্বরূপ'-এর 'আরোপ' করে স্থূল দেহবুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে রক্তমাংসের কামনাকেই ঐশী প্রেমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন।[১৬] সহজিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ 'রত্নসার'-এ বলা হয়েছে, 'মানুষ বিগ্রহ ভজি ব্রজপ্রাপ্তি হবে।'[১৭] সহজিয়া পদকর্তারাও লিখেছেন, 'স্বরূপ ভজিলে মানুষ পাবে।/আরোপ ছাড়িলে নরকে যাবে।।'[১৮]

বলা বাহুল্য, 'রূপ'-এর মধ্যে 'স্বরূপ'-এর 'আরোপ' করা বলতে বৈষ্ণব সহজিয়ারা 'রূপ'-কে বর্জন করার কথা বোঝাননি। দেহকে আশ্রয় করেই তাঁরা দেহাতীতকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন; সীমার মধ্যেই তাঁরা করেছেন অসীমের সাধনা। 'রূপ'-এর মধ্য দিয়ে 'স্বরূপ'-এ প্রত্যাবর্তনের এই দুশ্চর তপস্যায় সহজিয়া সাধকের পরকীয়া নায়িকা বা প্রেমিকাই ঐশী প্রেমের দীক্ষাদাত্রী গুর্বী। কবি চণ্ডীদাস তাঁর সাধনসঙ্গিনী রামী বা রামমণির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ চিত্তে বলেছেন- 'শুন রজকিনী রামী/ ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া/ শরণ লইনু আমি।/ তুমি বেদ মাতা হরের ঘরণী/ তুমি নয়নের মণি।।'[১৯]

সহজিয়া ধর্মে 'স্বরূপ'-এ প্রতিষ্ঠিত 'সাধকের চক্ষে প্রিয়তমা অনন্ত প্রেমের প্রতীক-রূপে প্রতীত হয় এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তার অনন্ত বৈচিত্র্য ও রহস্য নিয়ে তার দেহে আবির্ভূত হয়– এক কথায়, প্রিয়তমাই পরম

সত্যের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।’ [২০] মানবিক প্রেমচেতনার দিব্য প্রেমচেতনায় এই রূপান্তরই বৈষ্ণব সাধকের কাছে সহজোপলব্ধি।

## উপসংহার

সহজিয়া বৈষ্ণবদের এই সাধনা স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ বর্জিত এবং চরম সংযমের উপরে প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক এক পথ। চণ্ডীদাসের পদে একে সাপের মুখে ব্যাঙ নাচানোর মতো দুঃসাহসী কাজ বলা হয়েছে। সাধারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এই যৌনাচারমূলক কায়সাধনাকে ভালো চোখে না দেখলেও সহজিয়ারা দেহকে অস্বীকার না করে, বরং দেহের মধ্য দিয়েই দেহাতীত বা অসীমের সন্ধান করতে চেয়েছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকেও মানুষের অবদমিত কামপ্রবৃত্তিকে জোর করে দমন না করে সংযমের দ্বারা তার পরিশোধনের এই দর্শন অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানসম্মত। পরিশেষে বলা যায়, মানবিক স্থূল প্রেমচেতনাকে দুশ্চর তপস্যার মাধ্যমে দিব্য অধ্যাত্ম-চেতনায় রূপান্তর করার মধ্যেই এই সহজিয়া সাধনার চূড়ান্ত সার্থকতা।

## সূত্রনির্দেশ-

1. নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, ‘বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম’, দ্বিতীয় শৈব্যা সংস্করণ, কলিকাতা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ১৬-১৮
2. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০
3. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
4. অণিমা মুখোপাধ্যায়, ‘সতেরো শতকের রাঢ়-বাংলার সমাজ ও সাহিত্য’, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, অণিমা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৫৬
5. পরিতোষ দাস, ‘সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম’, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮, পৃ. ৬৪
6. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
7. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭
8. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
9. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
10. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ‘বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা/বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্যসাধনার ধারা’, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ভারবি, অক্টোবর ১৯৯৬, পৃ. ৬৫
11. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
12. পূর্বোক্ত
13. পরিতোষ দাস, ‘সহজিয়া ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম’ , পৃ. ১৩১
14. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩
15. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ‘বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা’, পৃ. ৬০
16. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১
17. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
18. পূর্বোক্ত

19. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি", 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', দশম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৮৯, পৃ. ৪৭
20. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা', পৃ. ৬৪